দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 MAR 1989
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

এসএসসি পরীক্ষা ঃ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়

আজ থেকে শুরু হচ্ছে দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা। এই এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে প্রতিবছরই দেশব্যাপী নানা ধরনের হৈচৈ হাঙ্গামার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে গবেষণাও কম হয়নি। বিস্তর আলাপ আলোচনা চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে গর্ত কয়েক বছর ধরে। মোটামুটি চার-সোয়া চার লাখ পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। গত বছরও চারটি বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৪ লাখ ১৬ হাজার ৬১ জন। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। এসএসসি পরীক্ষার সময় নকল প্রবণতা রোধের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়, এবারও তা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। নকল প্রবণতা রোধ করার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা যে রোধ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই নকল প্রবণতা রোধতো করা যায়ইনি, বরং উত্তরোত্তর তা বেড়েছে। প্রয়োজনের তাগিদেই এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র গ্রাম গ্রামান্তরে সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। শহর এলাকায় ১৪৪ ধারা জারীর মাধ্যমে নকলপ্রবণতা যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, মফস্বল এলাকায় তা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ফলে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছুটে গিয়ে গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেবার একটা হিড়িক পড়ে যায় বাংলাদেশে। সেই প্রবণতা রোধ করার জন্য নিয়ম করা হয় যে, পরীক্ষা কেন্দ্র কেউ বদল করতে পারবে না। অর্থাৎ শহরের স্কুল কলেজে রেজিস্ট্রেশন করে মফস্বলের কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেয়া যাবে নাঃ মফস্বল কেন্দ্রে রেজিস্ট্রেশন করেও শহরে আসা যাবে না। এই সিদ্ধান্তের দুটি দিক আছে। একটি হল, কেউ যদি আগে থেকেই শহরে থেকেও নকলের সুবিধার জন্য মফস্বলে রেজিস্ট্রেশন করায় তবে তাকে বাধা দেবার কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। অপরটি হচ্ছে, শহরের কেন্দ্র থেকে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের ওপর কড়াকড়ি হবে বেশী। এসএসসি পরীক্ষার সময় গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছি সেখানে মেলার আমেজ। প্রতিটা গাছের তলায় মাঠে, গ্রামের ঘর বাড়ির পাশে, বৈঠকখানায় নকল সরবরাহকারীদের রমরমা অবস্থা। জানালার পাশে এসে নাম ধরে ডাক দিয়ে নকল ছুঁড়ে দেয় তারা। সেখানকার পরিদর্শকরা বোধহয় অনেক খানি অসহায়। পুলিশও জানালার পাশ থেকে নকল সরবরাহকারীদের অনেকটা গুড়ের ওপর থেকে মৌমাছি সরিয়ে দেবার মত করে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দেয়। ভিড় আবার জমে। শত সহস্র কেন্দ্রে কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট পুলিশ যে দেয়া সম্ভব নয় সে কথা যে কেউ স্বীকার করবেন।

তা হলে এর বিকল্প কি? নিশ্চয়ই পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন। তা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা চলছে।

এরকম একটি পরিস্থিতি আছে বলেই এখনও নকলপ্রবণতা আছে। এবং এই নকলপ্রবণতা রোধ করতে গিয়ে লাঠিচার্জ, গুলি ও মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে মাঝে মাঝে। সেই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য অবশ্যই নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন।

এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে আর এক সংকট পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের। গণ টোকাটুকির দায়ে কিংবা অভিযোগে বহু পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হয়। এখানেও দু একজন থাকে যারা গণটোকাটুকিতে অংশগ্রহণ করে না। বিচারের নিয়ম হচ্ছে দশজন অপরাধী ছাড়া পেলে ছাড়া পাক, কিন্তু একজন নির্দোষ ব্যক্তিও যেন সাজা না পায়। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হলে অধিকাংশ দোষীর জন্য কম সংখ্যক হলেও নির্দোষ পরীক্ষার্থী অকারণ সাজা পেয়ে যায়। পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত থাকে, সেই ফলাফল জানতেও জান পেরেশান। ফলে পরবর্তী ভোগান্তির শিকার হয় নির্দোষ পরীক্ষার্থীরা। এই পরিস্থিতি অবসানের জন্য তেমন কোন পথ বের করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। এসএসসি পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর স্থগিত ফলের জন্য ঘুরতে ঘুরতে অনেক সময় নষ্ট হয় ছাত্র এবং অভিভাবকদের। ইতিমধ্যে এই সংকট সমাধানে যত রকম চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে তার মধ্যে বোধ করি সব চাইতে যুক্তিসঙ্গত চিন্তা হচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে অবজেকটিভ প্রশ্ন বেশী করে করা এবং তা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। এখন পর্যন্ত বোধ হয় দূর দূরান্তের হাজার হাজার স্কুলের ওপর চূড়ান্ত নম্বর প্রদানের ক্ষমতা দেয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। সরকার ১৯৯১ সাল থেকে পরীক্ষা পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রেও যে নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে না, তা বোধ করি হলফ করে বলা যাবে না। তবে এখনও হাতে সময় আছে সুতরাং নতুন পদ্ধতির সম্ভাব্য সমস্যাগুলো অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে তার একটা সমাধানের চিন্তাও আগাম করে রাখা ভাল।

বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত পরীক্ষা এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি আরও দুই বছর বহাল থাকবে। সময়ের বিবেচনায় এক দুই বছর তুচ্ছ ঘটনা হলেও একজন পরীক্ষার্থী কিংবা তার অভিভাবকের কাছে একটি শিক্ষা বছর কোনক্রমেই তুচ্ছ নয়। বর্তমান পাস ফেল পদ্ধতির জন্য প্রতি বছর শত শত ছাত্রছাত্রী এক দুঃসহ সংকটের মুখোমুখি হয়। কোথায়ও কোথায়ও দেখা যায় দু একটি লেটারসহ ছয় শতাধিক (প্রথম বিভাগ) নম্বর পেয়েও একটি মাত্র বিষয়ে ফেল করার জন্য গোটা বছরের জন্য ফেল করে যায় একজন ছাত্র। হতে পারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সে দুর্বল। কিন্তু ওই একটি বিষয়ে ফেল করার জন্য তার জীবন থেকে একটি বছর মুছে যাওয়া কি সঙ্গত? এক্ষেত্রে কখনও কখনও পরীক্ষণ বিষয়টিও জড়িত থাকতে পারে। যদি ধরে নেয়া হয় যে অমুক কেন্দ্রে গণটোকাটুকি হয়েছে অতএব নম্বর হিসাব করে দেয়া উচিত, তাহলে সেই কেন্দ্রের একজন নকল না করা ছাত্র অবিচারের সম্মুখীন হতে পারেন। এবং এই বিষয়টি নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে একজন বিজ্ঞ পরীক্ষকের ওপর।

এ ক্ষেত্রে খাতা পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে ঠিকই, কিন্তু জানা যায় পুনঃ পরীক্ষা মানে নম্বর ঠিকমত যোগ হয়েছে কি না তাই দেখা, পুনর্মূল্যায়ণ নয়। পুনর্মূল্যায়ণ কেন নয়? সে প্রশ্নে নিশ্চয়ই বোর্ড কর্তৃপক্ষের যুক্তি আছে, সে যুক্তি সম্ভবত এই যে, যে পরীক্ষক তিনশ খাতা দেখেন তার দুইশ নিরানব্বইটিতে যদি ন্যায়বিচার হয়ে থাকে, একটিতে শুধু অন্যায় করা হয়েছে, এ কথার অর্থ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের সততা ও নিষ্ঠার ওপর প্রশ্ন তোলা। যা করা হয়ত সঙ্গত নয়। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর পরই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে আর একটি সুযোগ প্রদান কেন করা যাবে না, তা বোঝা যায় না।

সে প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হল কোন পরীক্ষার্থী তা সে যত নম্বরই পাক না কেন মাত্র একটি বিষয়ে ফেল করলে তাকে পুনরায় সেই বিষয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ দেয়া হোক। তাতে পূর্ববর্তী পরীক্ষকের ওপর যেমন কোন দায় চাপে না, তেমনি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী তার যোগ্যতা প্রমাণেরও সুযোগ পায়। পরীক্ষার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এই নয় যে নিয়মকানুনের বেড়াজাল তৈরি করে কাউকে ফেল করিয়ে দেয়া। সবাই পাস করুক, সকল ছাত্র তাদের জীবন, তাদের ভবিষ্যৎ মসৃণ করে তুলুক এটাই সমর কাম্য।

আশা করি দেশের শিক্ষাবিদ মহল এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। কেননা এই সিদ্ধান্তের ওপর পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

—রেজোয়ান সিদ্দিকী